## আর্থিক নিষ্ক্রমণ (Economic Drain)

ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল ইউরোপে বাংলার সম্পদের বহির্গমন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষত পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরোক্ষভাবে হলেও বাংলার রাজনীতিতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার সুবাদে ইংরেজরা বাংলার সম্পদ প্রচুর পরিমাণে নিজেদের দেশে চালান করেছিল। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে এই সম্পদ বেরিয়ে যাবার ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা 'আর্থিক নিষ্ক্রমণ' (Economic Drain) নামে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থনীতিবিদ্ অম্লান দত্ত Economic Drain কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'অপহার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সার্বিকভাবে আর্থিক নিষ্ক্রমণ বা Economic Drain বলতে আমরা বুঝি—একটি উপনিবেশের সম্পদ যখন ঔপনিবেশিক শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিজের দেশে নিয়ে যায়, তার প্রতিদানে উপনিবেশকে কিছুই দেয় না এবং উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত পুঁজি উপনিবেশের অনুৎপাদক এলাকাগুলিতে বিনিযোগ করে, যা কখনোই সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের সহায়ক হয় না। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে হ্যারি ভেরেলেস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন শোর বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে সম্পদের নিষ্ক্রমণ নিয়ে তাদের মূল্যবান মতামত রেখেছিলেন। জন শোর ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত *Notes on Indian Affairs*-এ লিখেছিলেন—ভারতবর্ষ এক সময় যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ উপভোগ করত, তার একটা বিরাট অংশ চালান করা হয়েছে; এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সমৃদ্ধির জন্য তার শক্তিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে (India has been drained of a large proportion of wealth she once possessed ; and her energies have been sacrificed for the benefit of the few.)।

প্রকৃতপক্ষে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি তথা বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ আহরণের নেশায় মেতে ওঠে। রাজা বদলের পালায় অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে নজরানা ও পারিতোষিক বাবদ অকল্পনীয় পরিমাণ সম্পদ ইংরেজরা হস্তগত করেছিল। তার ওপর কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে মুনাফালাভের ব্যাপার তো ছিলই। পলাশি পরবর্তী যুগকে তাই ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পিয়ার "খোলাখুলি ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ" (Age of open and unshamed plunder) বলে অভিহিত করেছেন। এই সময় ইংরেজরা

যে প্রচুর পরিমাণে বাংলার সোনা, রুপো ও সম্পদ আহরণ করেছিল তাকে ব্রুক্স অ্যাডামস্ (Brooks Adams) 'পলাশির লুণ্ঠন' (Plassey plunder) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। ভেরেলস্ট লিখেছিলেন—১৭৫৭ সাল থেকে ইংরেজ কোম্পানি তার বাণিজ্যের জন্য চীনে বাংলা থেকে সোনা ও রুপো রপ্তানি শুরু করেছিল। ৬০-এর দশকে এর গড় বার্ষিক পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ টাকা। ফিলিপ ফ্রান্সিস বলেছেন—কোম্পানির কর্মচারীদের উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সম্পদ আহরণ করা এবং সেই সম্পদ দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া। এভাবে সম্পদ আহরণের ফলে এদেশের সম্পদের ওপর স্বল্পকালীন চাপ সৃষ্টি হয় এবং এগুলি ভগ্নদশাগ্রস্ত ও নিঃশেষিত বলে মনে হয়।

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ মূলত দুটি ধারায় হয়েছিল—(১) ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত বেসরকারি বণিকদের বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং (২) কোম্পানি কর্তৃক অনুসৃত অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে। কোম্পানির কর্মচারী ও বেসরকারি বণিকদের চরম আর্থিক লালসা বাংলার অর্থনীতিকে শ্রীহীন করে তুলেছিল। পলাশির পরবর্তীকালে নবাব বদলের ব্যবসা করে ইংরেজ কর্মচারীরা প্রচুর টাকা লাভ করেছিল। এই টাকাটা এসেছিল মূলত উপঢৌকন, পারিতোষিক এবং নজরানা প্রাপ্তির মাধ্যমে। এভাবে অবৈধ উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করার ব্যাপারে সবথেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভকে অনুসরণ করে ইংরেজ কর্মচারীরা ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ সালের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি টাকা পেয়েছিল। ১৭৬৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মিরজাফরের অবৈধ পুত্র নজম উদ্‌দৌল্লাহকে বাংলার মসনদে বসিয়ে জনস্টন, সিনিয়র, লিসেস্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রায় ৬২,৫০,০০০ টাকা পেয়েছিল। নায়েব নাজিম নিযুক্ত হবার পর রেজা খান কোম্পানির কর্মচারীদের ৪,৭৬,০০০ টাকা উপঢৌকন দিয়েছিলেন। অবৈধ অর্থ উপার্জনের নেশায় ইংরেজ কর্মচারীরা লিখিত প্রমাণ ছাড়াও প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছিল এবং তার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না।

পলাশি পরবর্তী বাংলায় ইংরেজ কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমেও প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে পারিতোষিক বা উপঢৌকন থেকে বেসরকারি ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে ইংরেজদের আয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বেশকিছু অত্যাবশ্যক পণ্যের ব্যবসা করে সাইক্স, ভেরেলেস্ট, বারওয়েল প্রমুখ ইংরেজ কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। বারওয়েল নিজেই স্বীকার করেছিলেন—বাংলায় থাকাকালীন তিনি মোট ৮০ লক্ষ টাকা রোজগার করেন। মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইক্স মাত্র দু'বছরে বাংলাদেশ থেকে সেলামি ও ব্যক্তিগত বাণিজ্য থেকে মুনাফা বাবদ ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর জেনারেল তখন তিনি অবৈধ চুক্তির মাধ্যমে তাঁর প্রিয়পাত্রদের বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। হেস্টিংসের ইমপিচ্‌মেন্টের সময় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তিনি বাঁধ নির্মাণ বা আফিম,

ঘোড়া, সামরিক সম্ভার প্রভৃতি জিনিস সরবরাহ করার জন্য তাঁর প্রিয়পাত্রদের সঙ্গে বেআইনি চুক্তি (illegal contract) করে তাদের সামনে অবৈধভাবে টাকা রোজগারের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কাল মার্কসের লেখাতেও হেস্টিংস-এর আমলের অবৈধ চুক্তির উল্লেখ রয়েছে। মার্কস বলেছেন—অ্যালকেমিস্টদের থেকেও ধূর্ত এই প্রিয়পাত্ররা শূন্য থেকে সোনা তৈরি করত। (His favourites received contracts under conditions whereby they cleverer than alchemists made gold out of nothing.)।

কোম্পানির এজেন্টরা উৎপাদকদের কাছ থেকে আফিম, রেশম প্রভৃতি পণ্য খরিদ করার সময় তাদের কাছ থেকে দামের একাংশ সেলামি হিসাবে নিয়ে নিত। উৎপাদকেরা এজেন্টদের সেলামি বা দস্তুরি দিতে অস্বীকার করলে তাদের পণ্য উৎকৃষ্ট নয়, এই অজুহাতে তাদের পণ্য এজেন্টরা খরিদ করত না। ফলে দরিদ্র রায়তেরা তাদের সেলামি দিতে বাধ্য হত।

উপরোক্ত উপায়ে ইংরেজ কর্মচারীরা যে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়ে বসেছিল তার প্রায় সবটাই তারা নিজের দেশে চালান দিত। নিজের দেশে বাংলাদেশ থেকে উপার্জিত সম্পদ পাঠানোর ব্যাপারে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা তাদের রোজগারের একটা বড়ো অংশ দেশে পাঠাত মূল্যবান পাথর বা হিরের মাধ্যমে। ফলে অসংখ্য মূল্যবান হিরে বাংলার বাইরে চলে যায়। তাছাড়া বেসরকারি ইংরেজ বণিকেরা তাদের অর্জিত মুনাফা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তহবিলে জমা রাখত। তারপর তারা ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্-এর কাছে বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ ভাঙিয়ে সে টাকা তুলে নিত। কিন্তু এই প্রথার বিনিময় হার ইংরেজ বণিকদের কাছে আদৌ লাভজনক ছিল না। তাছাড়া যে অর্থ তারা বেসরকারি বাণিজ্যের মারফত উপার্জন করত তার পরিমাণও কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর কাছে গোপন থাকত না। তাই তারা স্বদেশে টাকা পাঠানোর এক বিকল্প পন্থা বের করে। তারা ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানি মারফত দেশে টাকা পাঠাতে থাকে। এইসব ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি সন্তুষ্টচিত্তে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কারণ তারা এখন থেকে বাণিজ্যিক কারণে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্য আর দেশ থেকে সোনা বা রুপো আমদানি করল না, ইংরেজ বণিকদের গচ্ছিত অর্থ বাণিজ্য পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করে তা দিয়েই তারা বাণিজ্য চালাতে লাগল। অর্থাৎ বাংলা থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়েই বাংলা তথা ভারতের পণ্য ক্রয় করা চলতে থাকে। ফলে ভারতীয় অর্থনীতি দুদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল। পরবর্তীকালে ১৭৮০-র দশক থেকে বেসরকারি বণিকেরা অবশ্য এজেন্সি হাউসগুলির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতে থাকে। সুতরাং বেসরকারি ইংরেজ বণিক পরিচালিত বাণিজ্য এদেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিদেশে চালান করেছিল। ইংরেজ কোম্পানির জনৈক কর্মচারী জন বেব (John Babb) ১৭৮৮ সালে এই বেসরকারি ইংরেজ বণিকদের সম্পর্কে লিখেছিলেন—"এই লোকগুলি আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। এদের কেউই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় না। যে মুহূর্তে তাদের সম্পদ অর্জিত

হয় তারা দেশে পাঠায় এবং সেই পরিমাণে নিষ্ক্রমণ বেড়ে চলে" (Drain is increased by these men. None of them ever make or propose an establishment in Bengal. Their fortunes, as they acquire any, are removed to Europe and in so much increased the drain to this country.)।

ইংরেজ কোম্পানি অনুসৃত সরকারি নীতি (Public Policy) বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছিল। ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুতহারে বাংলার সম্পদ বাইরে চলে যেতে থাকে। বাংলার সম্পদ নিষ্ক্রমণের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ (investment)। ভারতীয় পণ্য বিশেষত বস্ত্রসামগ্রী এবং রেশম ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করার জন্য কোম্পানি সেগুলি বাংলায় কিনত। এইসব পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্য কোম্পানি যে খরচ করত, তাকেই বলা হত বিনিয়োগ বা Investment। ১৭৫৭ সালের আগে পর্যন্ত কোম্পানি এইসব পণ্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা-রুপো বা বুলিয়ন বাংলায় আমদানি করত। বছরে এই বুলিয়ন আমদানির বিনিময় মূল্য ছিল ৭ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ড। কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। পলাশির পর বাংলার রাজনীতিতে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার ফলে ইংরেজ কোম্পানি অবৈধ উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। এই অর্জিত অর্থ দিয়েই কোম্পানি ভারতীয় পণ্য ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ করতে থাকে এবং ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রুপো আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ১৭৬৫ সালের পর পরিস্থিতি একেবারেই পালটে যায়। দেওয়ানি বা বাংলার রাজস্বের ওপর নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করার পর কোম্পানিকে আর দেশ থেকে সোনা-রুপো আমদানি করে বাংলার থেকে রপ্তানি বাণিজ্য চালাতে হয়নি। বাংলা থেকে তারা যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত তা দিয়েই তারা রপ্তানিযোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে থাকে। ফলে ১৭৬৫ সালের পর বাংলায় বুলিয়ন বা সোনা-রুপো আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৫-৬৬ থেকে ১৭৭০-৭১ সাল পর্যন্ত এই ছয় বছরে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক বাংলা থেকে আদায়ীকৃত নিট রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৩০,৬৬,৭৬১ পাউন্ড। এর থেকে ৪০,৩৭,১৫২ পাউন্ড অর্থাৎ ৩০.৮ শতাংশ কোম্পানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ বা Investment খাতে ব্যয় করেছিল। গভর্নর হ্যারি ভেরেলেস্ট ১৭৬৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর লিখেছিলেন—"প্রত্যেকটি ইউরোপীয় কোম্পানিই এদেশ থেকে টাকা নিয়ে এদেশেই বিনিয়োগের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। অথচ এই প্রদেশের আদৌ কোন সম্পদ বৃদ্ধি ঘটেনি" (Each of the European Companies, by means of money taken up in the country, have greatly enlarged their annual Investments, without adding to the riches of the province.)। তাছাড়াও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হবার পর ইংরেজ কোম্পানি চীনের চা ও রেশম কেনার জন্য বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রুপো চীনে পাঠাতে শুরু করে। এছাড়াও বাংলা থেকে যে রাজস্ব কোম্পানি লাভ করত তার থেকে সে বম্বে ও মাদ্রাজ

প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক ব্যয় মেটাত এবং সেখানকার রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য পুঁজি সরবরাহ করত। তদুপরি অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কোম্পানি ভারতে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়েছিল, তার ব্যয়ভার বহন করেছিল বাংলার রাজস্ব।

সুতরাং দেখা যায় যে ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—এদেশ থেকে অর্জিত অর্থ এদেশের পণ্য ক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ করা। ১৭৫৭ সালের পর কোম্পানি এদেশে ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়ে যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিল তার উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে সে রপ্তানি পণ্য ক্রয় করে ইউরোপের বাজারে চালান দিয়েছিল। ফলে ১৭৫৭ সাল থেকে কোম্পানি কর্তৃক এদেশ থেকে পণ্যের মাধ্যমে আর্থিক নিষ্ক্রমণ আরম্ভ হয়ে যায়। যোগেশচন্দ্র সিংহ দেখিয়েছেন—১৭৫৭-১৭৬৫ সালের মধ্যে ২০ লক্ষ পাউন্ড এ পথে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে চালান হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি বাংলা থেকে তোলা রাজস্বের একটা অংশ বিনিয়োগ করে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করে সেগুলি ইউরোপের বাজারে পাঠিয়ে আর্থিক নিষ্ক্রমণের মাত্রা ও পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

জেমস্ গ্র্যান্ট ১৭৮৬ সালে তাঁর *Analysis of the Finances of Bengal*-এ লিখেছিলেন—বছরে বাংলার ১ কোটি টাকা 'ইনভেস্টমেন্ট' বা বিনিয়োগ মারফত বিদেশে চালান হয়ে যায়। তিনি ১৭৮৬ সালে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বছরে ১০,০০০,০০০ টাকার পণ্য বাংলা থেকে বিদেশে রপ্তানি করত। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চালানোর জন্য কোম্পানি ২০,০০,০০০ টাকার সোনা-রুপো বছরে সেখানে পাঠাত। অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি ও বেসরকারি বণিকেরা বছরে ৬০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করে বাংলা থেকে রপ্তানি পণ্য কিনত। ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলার বার্ষিক আর্থিক নিষ্ক্রমণের পরিমাণ ছিল ১,৮০,০০,০০০ টাকা। ঐতিহাসিক হোল্ডেন ফারবার (Holden Furber) তাঁর *John Company at Work* গ্রন্থে হিসাব করে দেখিয়েছেন—ইংরেজ কোম্পানির 'ইনভেস্টমেন্ট' এবং চীনে সোনা-রুপো (বুলিয়ন) রপ্তানির মাধ্যমে ১৭৮৩-৮৪ সাল—১৭৯২-৯৩ সালের মধ্যে বাংলার থেকে বছরে ১.৭৮ মিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের নিষ্ক্রমণ হয়েছিল। পরবর্তীকালের আর্থিক নিষ্ক্রমণের হিসেব দিয়েছেন জি. এ. প্রিন্সেপ। তাঁর মতে, ১৮১৩-১৮২২ সালের মধ্যে বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণের বার্ষিক পরিমাণ ছিল ৩ মিলিয়ন থেকে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড। মন্টগোমারি মার্টিন (Montgomery Martin) ১৮৩৮ সালে লিখেছিলেন—এই ৩০,০০,০০০ পাউন্ডের বার্ষিক নিষ্ক্রমণ ত্রিশ বছর ধরে ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদের বার্ষিক হারে হিসাব করলে গিয়ে দাঁড়ায় ৭২,৩৯,৯৭,৯১৭ পাউন্ড। এই পরিমাণ সম্পদ যদি ইংল্যান্ড থেকেও নিষ্ক্রান্ত হত তবে ইংল্যান্ডও একটি দরিদ্র দেশে পরিণত হত। ইরফান হাবিব বলেছেন—১৮০১ সালে ভারতবর্ষ থেকে ৪.২ মিলিয়ন পাউন্ড ইংল্যান্ডে আর্থিক নিষ্ক্রমণ হয়েছিল এবং তা ছিল ব্রিটেনের

জাতীয় আয়ের ২ শতাংশেরও বেশি এবং তদানীন্তন ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের প্রায় ৩০ শতাংশ।

থিওডর মরসিন, পি. জে. মার্শাল প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা অবশ্য গোটা প্রক্রিয়াটিকেই বাংলা থেকে একতরফা সম্পদের নিষ্ক্রমণ বা প্রতিদানহীন চালান বলে মেনে নিতে চাননি। তাঁরা নিষ্ক্রমণ পরিমাপের সময় অদৃশ্য সেবা ও আমদানির হিসাবের কথা তুলেছেন। এই অদৃশ্য সেবা বা আমদানি বলতে তাঁরা বুঝেছেন—কোম্পানি বাংলায় বিমা, ব্যাংকিং, এজেন্সি হাউস, জাহাজ শিল্প, পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে তার অর্জিত আয়ের একাংশ ব্যয় করেছিল। সুতরাং তাঁদের মতে, বাংলা যে কেবলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলা চলে না। পিটার মার্শাল অপহারের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও পলাশি পরবর্তী দশকগুলিতে বাংলার লাভের দিকের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের সম্পদ নিষ্ক্রমণ সংক্রান্ত উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই ধরনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিকে আড়াল করার একটা প্রবণতা স্পষ্ট। বাংলা তথা সমগ্র ভারতকে ব্রিটেনের উপনিবেশ করে রাখার তাগিদেই কোম্পানি এখানে কিছু ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। বাংলায় কিছু কিছু খাতে তারা ব্যয় করেছিল বলেই যে তারা বাংলার বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিদেশে চালান করে বাংলার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি—এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন।

পলাশি পরবর্তী লুণ্ঠন ও বাংলার আর্থিক নিষ্ক্রমণ বাংলার অর্থনীতিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। রপ্তানি বাণিজ্যের পুঁজি বাংলা থেকেই সংগৃহীত হত বলে ইংরেজ কোম্পানি তথা অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি বিদেশ থেকে সোনা-রুপোর আমদানি বন্ধ করে দেয়। তার ওপর কোম্পানি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য চীনে প্রচুর পরিমাণে বাংলার সোনা-রুপো রপ্তানি করেছিল। একদিকে এই দুই ধাতুর আসার পথ রুদ্ধ হওয়া এবং অন্যদিকে এই দুই ধাতু চীনে প্রচুর পরিমাণে চলে যাবার ফলে বাংলাদেশে সোনা-রূপার সরবরাহ হ্রাস পায়। ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে টাকার জোগান হ্রাস পায় এবং মারাত্মক মুদ্রা-সংকট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ অর্থ সোনা, রুপো ও পণ্যের মাধ্যমে বেরিয়ে যাবার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে স্থবিরতা (stagnation) এসেছিল। এই অর্থনৈতিক স্থবিরতা টাকার বাজারের (money market) ওপর অবাঞ্ছিত চাপ সৃষ্টি করেছিল। পলাশি পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানি ও বেসরকারি বণিকদের উদ্যোগে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অধ্যায়ের বাণিজ্য অংশ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্টই দেখেছি যে রপ্তানি বাণিজ্যবৃদ্ধির ফলে ভারতীয় বণিক বা উৎপাদকেরা আদৌ লাভবান হয়নি। বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল এবং প্রাথমিক উৎপাদকেরা—আফিম চাষি, লবণ প্রস্তুতকারক মোলুঙ্গি, রেশম তাঁতি—সকলেই কোম্পানির লালসাগ্রস্ত কর্মচারী ও গোমস্তাদের উৎপীড়নের শিকার হয়েছিল। আর্থিক নিষ্ক্রমণের কুপ্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছিলেন—দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাবার

ফলে আর্থিক নিষ্ক্রমণ এত ব্যাপকভাবে হয়েছিল যে পৃথিবীর সবথেকে সমৃদ্ধশালী দেশগুলিতে তা ঘটলে, সেগুলিও দরিদ্র হয়ে যেত। এই ঘটনা ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করেছিল (So great an Economic Drain out of the resources of a land would impoverish the most prosperous countries on earth, it has reduced India to a land of famines.....)।

বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ বাংলাকে দরিদ্রতর করলেও তা গ্রেট ব্রিটেনকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল সন্দেহ নেই। রজনী পাম দত্ত *India Today* গ্রন্থে বলেছেন—ভারত থেকে অপহৃত সম্পদের ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক ইংল্যান্ড গড়ে উঠেছিল। কার্ল মার্কস তাঁর *Capital*-এর তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন—ভারত থেকে নিষ্ক্রান্ত সম্পদ ইংল্যান্ডে গিয়ে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এদেশ থেকে চালান হওয়া সম্পদ ইংল্যান্ডের এক শ্রেণীর মানুষকে অর্থশালী করে তোলে এবং তারা সেই সঞ্চিত অর্থ ইংল্যান্ডে শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ করেছিল। সুতরাং ভারত থেকে নিষ্ক্রান্ত সম্পদ যে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির অন্যতম উৎস হিসাবে কাজ করেছিল, একথা অস্বীকার করা যাবে না।